Radio Serial – Episode 25

Depleted State of Natural Resources

পর্ব ২৫ – আত্মহত্যা মহাপাপ

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপ – সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষ থেকে ছন্দা মুখোপাধ্যায়

চরিত্র – অর্ণব, সায়ন, অয়ন্তিকা (কলেজ পড়ুয়া), অয়ন্তিকার মামা ও মামী

প্রথম অংশ

(কলেজ ক্যান্টিন – কাপ প্লেটের শব্দ, কথার আওয়াজ, কিছু দূরে কেউ গান গাইছে টেবিল বাজিয়ে)

সায়ন : (স্বগত) অর্ণব রোজ কলেজে আসতে এত দেরি করে কেন কে জানে। একেবারে যাচ্ছেতাই। এদিকে এস-আর-বি স্যার তাড়া দিচ্ছেন।

অয়ন্তিকা : কিরে সায়ন, মুখটা ব্যাজার করে বসে আছিস কেন? তোর জুড়িদার অর্ণব কোথায় গেল?

সায়ন : অয়ন্তিকা আয়, একা একা বসে বোর হচ্ছিলাম। আমি অর্ণবের জন্যে বসে আছি আধঘণ্টা ধরে। আমরা সবাই ঠিকঠাক কলেজ পৌঁছে যাই কিন্তু অর্ণব যে বাসে চড়ে সেটাই জ্যামে আটকে যায়। অনেকদিন ধরে শুনছি একই গল্প।

অয়ন্তিকা : জ্যামের কথা আর বলিসনা, আজ আমিও আটকে গেছিলাম। অর্ণবকে বলবি তাড়া থাকলে হেঁটে কলেজে আসতে, সময় বাঁচবে, পয়সাও বাঁচবে। ওই দেখ সায়ন, তোর জুড়িদার আসছে।

সায়ন : তাকিয়ে দেখ একবার - নির্বিকার, হেলতে দুলতে আসছে। দেরি হয়েছে, কোন খেয়াল নেই।

অর্ণব : কিরে অয়ন্তিকা, কেমন আছিস?

অয়ন্তিকা : আমি ঠিক আছি, কিন্তু সায়ন বেজায় রেগে গেছে তোর ওপর। ওকে আগে ঠাণ্ডা কর।

অর্ণব : আরে, রেগে যাওয়ার কি আছে। আজ রাস্তা অবরোধ ছিল জানিস? ঠিক আছে, সায়ন খেতে ভালবাসে, ওকে আজ বিরিয়ানি খাইয়ে দেব, রাগ কমে যাবে।

অয়ন্তিকা : (হেসে) আমাকে খাওয়াবি না? আমিও রেগে আছি কিন্তু। আচ্ছা, তোদের মাণিকজোড়ের এত রাগারাগির কারন কি? সায়ন মুখ গোমড়া করে আছে, অর্ণব তাকে বিরিয়ানি খাওয়াচ্ছে। লাগতা হ্যায় দাল মে কুছ কালা হ্যায়।

অর্ণব : দাল ঠিক হি হ্যায়। সায়ন খামোখা চাপ নিচ্ছে।

সায়ন : খামোখা চাপ নিচ্ছি? তোর বলতে লজ্জা করল না? কাল তুই কোথায় কেটে পড়লি, এস-আর-বি স্যার অনেকের সামনে আমাকে ধরে ধমক দিলেন। বললেন, লেখা দেবার তারিখ পেরিয়ে গেছে, সেটা খেয়াল আছে?

অয়ন্তিকা : কি লেখা? ক্লাস নোটস?

অর্ণব : আরে না না। কলেজ ম্যাগাজিনে আমার আর সায়নের একটা লেখা ছাপা হয়েছিল গতবছর মনে আছে?

অয়ন্তিকা : খুব মনে আছে। ঝড় আর বন্যার জন্যে কীরকম ঘরবাড়ি তৈরি করতে হয় সেই নিয়ে লিখেছিলি। এস-আর-বি স্যার প্রশংসা করেছিলেন লেখাটার।

সায়ন : স্যার বলেছিলেন গত বছরের মত এই বছর আরেকটা লেখা তৈরি করতে। এটা লিখতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে কমে যাচ্ছে, কমে গেলে কি হয় – এইসব বিষয়ে।

অয়ন্তিকা : ভাল সাবজেক্ট, লিখে ফেলছিস না কেন?

সায়ন : কারণ অর্ণব খুব ব্যাস্ত, ওর সময় হচ্ছে না। দেখলি তো নিজের চোখে কখন এলো।

অয়ন্তিকা : ইন্টারনেট সার্চ করে লিখে দে, বেশী খাটতে হবে না। একদিনেই হয়ে যাবে।

অর্ণব : স্যার বলে দিয়েছেন সেই কায়দা চলবে না। বলেছেন ফেলুদার কালে ছিল সিধুজ্যাঠা আর তোমাদের কালে হয়েছে গুগলমামা। চাচা-মামা দিয়ে হবে না, যা লিখবে নিজেরা চোখে দেখে যাচাই করে লিখবে।

অয়ন্তিকা : ওরে বাবা, তাহলে তো মুশকিল। তা কোথায় গিয়ে তোরা ন্যাচারাল রিসোর্স ডিপ্লিশন – আই মিন প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস দেখবি?দুর্ভিক্ষ হচ্ছে এমন জায়গায় যেতে হবে তাহলে।

অর্ণব : তা কেন? যেকোনো শহরে বা গ্রামে গেলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। আমরা কোনো গ্রামে যাব ভাবছি।

অয়ন্তিকা : তোরা সিরিয়াস? সত্যি যাবি?

সায়ন : হ্যাঁ যাব। তুই জিজ্ঞাসা করছিস কেন?

অয়ন্তিকা : কারণ আজ শুক্র বার আর আমি কাল মামার বাড়ি যাচ্ছি উইকএন্ড কাটাতে। মহুলডাঙ্গা নাম শুনেছিস? জায়গাটা পুরোপুরি গ্রাম নয়, আজকাল একটু শহুরে ভাব হয়েছে। কিন্তু তোরা অনেক মালমসলা পাবি লেখার জন্যে। যাবি তো বল, মামাকে জানাতে হবে।

অর্ণব : জানিয়ে দে তাহলে, এখনই ফোন কর।

সায়ন : তারপর মামার বাড়ির আদর। মামার বাড়ি ভারি মজা, কিল চড় নাই।

অয়ন্তিকা : যেতে যখন চাইছিস তখন চল। পরে আমাকে দোষ দিসনা।

সায়ন : যাব্বাবা। তুই মামার বাড়ি নিয়ে যাবি, তোকে দোষ দেব কেন?

অয়ন্তিকা : কারণ তোরা আমার মামাকে দেখিসনি। একে স্কুলের হেডমাষ্টার, তার ওপর ইয়া মোটা গোঁফ। যখন তখন পড়া জিজ্ঞেস করে।

অর্ণব : সে হোক, আমরা সামলে নেব। তোর মামা হেডমাস্টার তো? মনে হচ্ছে ওনার কাছে লেখার জন্যে অনেক মেটিরিয়াল পেয়ে যাব।

অয়ন্তিকা : আমার মামীর থেকেও অনেক কিছু জানতে পারবি। মামীর সাবজেক্ট পরিবেশ সংরক্ষণ।

সায়ন : আর লোভ দেখাসনা। কাল কখন বেরতে হবে সেটা বল।

অয়ন্তিকা : সকাল সাতটায় হাওড়া স্টেশনে বড় ঘড়ির নিচে পৌঁছে যাস। মনে থাকবে?

সায়ন : খুব মনে থাকবে।

অয়ন্তিকা : অর্ণব, তুই আবার দেরি করিসনা যেন। রাস্তায় জ্যাম থাকলে হেঁটে চলে যাস।

(সমবেত হাসি)

দ্বিতীয় অংশ

(মফস্বলের রাস্তা, রিক্সা আর টোটোর আওয়াজ, টিউবওয়েল থেকে জল তুলছে কেউ। রিক্সাওয়ালা জানতে চাইছে কোথায় যাবে, গাড়ি লাগবে কিনা)

অয়ন্তিকা : না কাকু, রিক্সা লাগবেনা। আমরা হেঁটে যাব।

অর্ণব : কত দূর মামার বাড়ি? অনেকটা?

অয়ন্তিকা : সামনেই, এখান থেকে চার-পাঁচটা বাড়ি পরে। ওই যে একতলা, সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছ।

সায়ন : আর সামনে শিংঅলা গরু, ওটাই বোধহয় ল্যান্ডমার্ক।

অয়ন্তিকা : ঠিক বলেছিস, আমি তো প্রত্যেকবার ওই গরুটাকে দেখেই মামার বাড়ি চিনতে পারি। তুইও ভাল করে দেখে রাখ, পরে কাজে লাগবে। বাড়ি এসে গেছে, এবার ভেতরে চল। চলে আয়, তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দে।

মামী : ওমা, খুকু এসেছিস? দেরি হল কেন? ট্রেন লেট ছিল নিশ্চয়। তোর মামা খুব চিন্তা করছিল।

অয়ন্তিকা : এই দেখো কারা এসেছে আমার সঙ্গে।

সায়ন : আমরা খুকুর বন্ধু।

অয়ন্তিকা : (ভেঙ্গিয়ে) 'আমরা খুকুর বন্ধু'। মার খাবি আবার খুকু বললে। ওটা কেবল বড়রা বলবে। তোরা অয়ন্তিকা বলবি।

মামী : ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত রাগ করেনা। ওই তোর মামা এসে গেছে।

মামা : এসে গেছিস তোরা? এরাই তোর বন্ধু?

অয়ন্তিকা : হ্যাঁ, এ হচ্ছে সায়ন আর ও অর্ণব।

মামা : বেশ, বেশ। তোমরা মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও।

অর্ণব : আপনি চিন্তা করবেন না - ট্রেনে ঝালমুড়ি, চপ এইসব খেয়ে পেট ভরে গেছে।

অয়ন্তিকা : মামা, ওদের এখন অন্য খিদে। ওরা কলেজ ম্যাগাজিনের জন্যে একটা লেখা তৈরি করবে, তোমার আর মামীর কাছে সেই বিষয়ে জানতে চায়।

মামা : তাই নাকি? তোমরা তাহলে লেখক? কি বিষয় নিয়ে লিখছ তোমরা?

অর্ণব : প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে কমে যাচ্ছে আর তার ফলে আমাদের কি কি বিপদ হতে পারে সেই বিষয়ে লিখব। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না।

মামা : এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ভাল করে লেখ। কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপলে অনেকেই পড়বে।

সায়ন : আপনি আমাদের একটু বলে দিন কি লিখব আর কিভাবে লিখব। আমরা জানি মামীও পরিবেশ বিষয়ে অনেক কিছু জানেন, ওনার কাছেও শুনবো। আমাদের স্যার বলেছেন সারা পৃথিবীর কথা না লিখে কোন একটা জায়গায় বাস্তবে কি ঘটছে সেটা লিখতে।

মামা : খুব ভাল বলেছেন তোমাদের স্যার। এই ভাবে লিখলে তোমরা বিষয়টা নিজেরা বুঝতে পারবে আর অন্যদেরও বোঝাতে পারবে।

অয়ন্তিকা : কিন্তু লেখাটার একটা ভুমিকা থাকা দরকার, তাই না মামা?

মামা : সে তো বটেই। তোমরা শুরুটা এই ভাবে করতে পারো - প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে। দাঁড়াও এক মিনিট। তোমরা চা খাও নাকি?

অর্ণব : তা খাই।

মামা : বেশ। ও খুকুর মামী, চম্পাকে বলনা আমাদের একটু চা খাওয়াতে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম - পঞ্চভূত কাকে বলে জান তোমরা? ভূমি, জল, তেজস বা আগুন, মরুত বা বাতাস, আর ব্যোম বা শূন্য – এই হল ব্রহ্মাণ্ডের পাঁচ উপাদান।

অর্ণব : হ্যাঁ, এটা শুনেছি।

মামা : বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কথা ছেড়ে দাও, আমাদের এই নীল গ্রহটার জন্য অত্যন্ত জরুরি উপাদান হল এই পাঁচটার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় আর চতুর্থ। মানে মাটি, জল আর বাতাস। এই তিনটের জন্যই এখানে প্রানের সৃষ্টি হয়েছে, এদের জন্য মানুষ আর পুরো জীবজগত বেঁচে আছে।

সায়ন : আমরা স্কুল থেকেই পরিবেশ বিদ্যা পড়েছি, এই বিষয়টা মোটামুটি জানি।

মামা : হ্যাঁ, সবাই বইতে পড়েছে। কিন্তু সেই জ্ঞান দিয়ে কাজের কাজ বিশেষ কিছু হচ্ছে? ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে, দেখছে, শুনছে - কিন্তু পৃথিবীর দুর্দশা শেষ হচ্ছে না। কেন এরকম হচ্ছে ভেবে দেখেছ?

মামী : একটু পরে ভেবো - এখন চা হয়ে গেছে, খেয়ে নাও। সঙ্গে কটা বিস্কুট দিয়েছি, সেগুলো খেও।

অয়ন্তিকা : মামী, তুমি বোসো। আমি দিয়ে দিচ্ছি চা।

মামা : চা খেয়ে তোমরা চান করে নাও একে একে। তারপর ভাত খেয়ে আবার আলোচনা করা যাবে।

মামী : সেই ভাল, রান্নাও একটু বাকি আছে। তোমরা এখন চা খাও, চম্পা খুব ভাল চা বানায়। তোমাদের মামার আবার দিনে পাঁচ-ছ'বার চা না খেলে হয় না।

মামা : সব চা কি আমার পেটে যায়? অর্ধেক চা তো আমার গোঁফে লেগে থাকে।

(সমবেত হাসি)

তৃতীয় অংশ

সায়ন : বাড়িতে কক্ষনো এত ভাত খাই না। এত খিদে পেয়েছিল বুঝতে পারিনি।

অয়ন্তিকা : মহুলডাঙ্গাতে এলে খিদে বেড়ে যায়। লোকে বলে এখানকার জল খেলে সব হজম হয়ে যায়।

অর্ণব : সাঁটিয়ে খাচ্ছিস সে তো দেখছিলাম। চান্স পেলেই যতটা পারিস পেটে ঠেসে নিস। এবার চল মামার কাছে, উনি বলেছিলেন খাওয়ার পরে আবার কথা হবে।

সায়ন : মামা বসার ঘরের দিকে গেলেন, ওখানেই চল।

অয়ন্তিকা : এইদিক দিয়ে আয়। মামা, এসে গেছি। এবার বল কি বলছিলে।

মামা : হ্যাঁ, প্রাকৃতিক সম্পদ কমে গেলে কি হয়, তাইতো?

অর্ণব : সেই বিষয়টা তো শুনবো, আর নিজেদের চোখে দেখতে চাই প্রাকৃতিক সম্পদ কমে গেলে কি হয়। মানুষের কি কি কষ্ট হয়।

মামা : শুধু মানুষ কেন, গাছপালা পশু-পাখিদের কষ্ট হয়না? আমাদের মহুলডাঙ্গা জায়গাটা ঘুরে দেখ, তাহলে অনেক কিছু বুঝতে পারবে।

অয়ন্তিকা : কেন, মহুলডাঙ্গায় কি হয়েছে মামা?

মামা : হয়েছে অনেক কিছুই। কেবল ধীরে ধীরে হয়েছে বলে তোমাদের চোখে পড়েনি। আমি যখন প্রথম এখানকার স্কুলে চাকরি পেয়ে আসি, তখন ঘরবাড়ি মানুষজন অনেক কম ছিল। চারপাশে উঁচু-নিচু টিলা, মাঝে মাঝে চাষের জমি, আর অনেক মহুল গাছ – তোমরা যাকে বল মহুয়া।

অর্ণব : এখানে চাষবাস হত? এই জায়গাটা এখন তো প্রায় শহর।

মামা : চাষ হত বছরে একবার বরষার জলে। অনেক মহুল গাছ ছিল চারিদিকে। সেই গাছের বীজ আর ফুল, কেঁদ আর শাল গাছের পাতা বিক্রি করে গরীব মানুষ বেঁচে থাকতো। তারপর শহর হল, চাষের জমি ঘুচে গেল। অতোগুলো মহুল গাছ ছিল, সেগুলো কাটা পড়ল।

অর্ণব : এই গাছ কেটে শহর বানানো কবে থেকে শুরু হল মহুলডাঙ্গায়?

মামা : প্রায় কুড়ি বছর আগে যখন এখানকার ছোট রেল স্টেশনটা জংশন হয়ে গেল। সেই সময়েই কয়েকটা পাথর খাদান তৈরি হল এদিকে। পাথর ভাঙ্গা কল বসল। দলে দলে মানুষ এলো নানা জায়গা থেকে। আগে দু-তিনটে দোকান ছিল এখানে, শনিবারে হাট

বসত হাটতলায়। এত লোকজন হয়ে গেল মহুলডাঙ্গায়, বড়সড় বাজার বসে গেল রাস্তার দুপাশে। জমির দাম বেড়ে গেল রাতারাতি। সব চাষের জমি বিক্রি হয়ে গেল বাড়ি আর বাজার বানাবার জন্য।

সায়ন : তারপর?

মামা : তারপর এখানকার মানুষের অবস্থা পাল্টে গেল। যারা গেরস্থ চাষি ছিল, তারা হল ছোট দোকানদার বা বড় দোকানের কর্মচারী। নেহাত দীনদরিদ্র যারা তারা হল রেল ষ্টেশনের কুলি আর পাথর খাদানের মজুর। যারা পাথর ভাঙ্গার কলে কাজ করতে গেল তাদের বুকে জমা হল পাথরের গুঁড়ো, দুরারোগ্য শ্বাস রোগ হল অনেকের।

সায়ন : কি কাণ্ড। এর নাম উন্নয়ন?

মামা : তবেই বোঝো। খোলা জমি গেল, গাছগুলো গেল। তার সঙ্গে গেল হরেক রকম পাখি, কাঠবেড়ালি, ভাম, বেজি, সাপ, শেয়াল আরো কত কি। আমাদের চোখের সামনে মহুলডাঙ্গা হয়ে গেল মরুডাঙ্গা।

অয়ন্তিকা : ঠিক বলেছ। এখন মনে পড়ছে ছোটবেলায় যখন আসতাম তখন কত গাছ ছিল, পাখি ডাকত। এত গরমও পড়ত না তখন।

মামা : এই গল্পটা শুধু মহুলডাঙ্গার নয় – একই রকম ঘটনা ঘটছে সারা দেশে, পৃথিবীর নানা জায়গায়। মানুষ আজকের খিদে মেটাতে গিয়ে আগামীকালের সঞ্চয় ভেঙ্গে খেয়ে ফেলছে। ভাবছে না তার সন্তান কি খাবে।

অর্ণব : আমরা এই জায়গাটা একটু ঘুরে দেখতে পারি। তাহলে আমাদের লেখায় কিছু উদাহরণ দিতে পারব মহুলডাঙ্গার অবস্থা থেকে।

অয়ন্তিকা : হ্যাঁ, সেই ভাল। আমরা একটু বেড়িয়ে আসতে পারি।

মামা : তোমরা তাহলে একটা কাজ করো। চম্পাদের পরিবার এখানকার পুরনো বাসিন্দা। একটু অপেক্ষা কর, চম্পার কাজ শেষ হয়ে গেছে, ও এখনই বাড়ি ফিরবে। ওর সঙ্গে ওদের পাড়ায় যাও, বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে কথা বল। চম্পার শ্বশুরমশাই তোমাদের অনেক কিছু বলতে পারবেন।

অর্ণব : সেই ভাল। সায়ন, তোর ব্যাগে খাতা আর পেন আছে, নিয়ে নে। আমরা ফোনে কিছু ছবি তুলে নেব।

অয়ন্তিকা : ও চম্পাদি, তোমার কাজ শেষ হল? চল, তোমাদের পাড়ায় বেড়াতে যাব আমরা।

সায়ন : খালি বেড়াতে যাচ্ছি না আমরা। অয়ন্তিকা, তুই যা শুনবি সব লিখে নিবি।

অয়ন্তিকা : লিখতে বয়ে গেছে, আমি খালি ছবি তুলবো। ওই তো চম্পাদি এসে গেছে।

মামা : চম্পা, তুমি খুকু আর ওর বন্ধুদের নিয়ে যাও তোমাদের পাড়ায়। ওরা তোমার শ্বশুরমশাই আর অন্য বয়স্ক মানুষদের থেকে শুনবে আগে মহুলডাঙ্গা কেমন জায়গা ছিল।

অয়ন্তিকা : হ্যাঁ, চম্পাদি বুঝে গেছে কি করতে হবে। এখন চলো তো। মামা, মামী, আসছি আমরা।

মামী : বেশী দেরি করোনা তোমরা।

চতুর্থ অংশ

মামা : তোমাদের তো অনেক সময় লাগলো, অনেক গল্প শুনলে নিশ্চয়?

মামী : আমার তো চিন্তা হচ্ছিল, অনেক আগে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমি আবার চম্পাকে ফোন করে খবর নিলাম।

অয়ন্তিকা : মামী, তুমি আর পাল্টালে না। আমরা কি এখনও ছোট আছি নাকি?

মামী : আহা, তা নয়। আমি ভাবছিলাম অচেনা জায়গা, ভুল রাস্তায় চলে যাস যদি। তাছাড়া অনেক আগে ভাত খেয়েছিস, নিশ্চয় খিদে পেয়ে গেছে।

অয়ন্তিকা : মামী জানো চম্পাদির পাড়ায় একটা দোকানে দারুন আলুর চপ বানায়, মুড়ি আর আলুর চপ খাওয়াল চম্পাদি।

মামী : তা বেশ করেছে।

মামা : এবার তোমরা বল পুরনো মহুলডাঙ্গার কি কথা জেনে এলে।

অর্ণব : মামা, আমি আগে ভাবতাম জঙ্গল এলাকায় যারা থাকে তারা খুবই কষ্টে থাকে। অল্প একটু ফসল হয়, দোকান বাজার তেমন নেই, খাওদাওয়ার খুব কষ্ট নিশ্চয়।

মামা : তা নতুন কথা কি জানলে?

অর্ণব : সহদেব জেঠু, মানে চম্পাদির শ্বশুরমশাই বললেন জঙ্গল নাকি খেতে দিত। বৃষ্টি না হলে, ধানগাছ শুকিয়ে গেলেও জঙ্গলে কিছু না কিছু খাবার জিনিস পাওয়া যেত।

সায়ন : হ্যাঁ, অর্ণব ঠিক বলেছে। ওনারা কত গাছের নাম বললেন, কখনো নাম শুনিনি, কোন গাছের পাতা খাওয়া যায়, কোনটার শেকড় বা কন্দ।

অয়ন্তিকা : মহুল গাছের কথা বলছিলেন বারবার। বলছিলেন ওই গাছ ওনাদের কাছে পবিত্র।

মামা : ওনাদের জীবনে মহুলগাছের গুরুত্ব অন্যরা বুঝতে পারেনা। তাই বাইরের লোকেরা এসে বাড়ি আর রাস্তা বানাবে বলে অনেক মহুলগাছ কেটে ফেললো।

অর্ণব : সেই কথা সহদেব জেঠু বলছিলেন।

মামা : তোমরা ভেরিয়ার এলুইনের নাম শুনেছ? উনি মধ্য ভারতের আদিবাসী জীবন নিয়ে অনেক বই লিখেছেন। ওনার লেখায় পাই, ওই অঞ্চলের এক আদিবাসী ভদ্রলোক স্বর্গ আর নরকের তফাত বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিরাট বড় জঙ্গল কিন্তু সেখানে একটাও মহুল গাছ নেই। সেইটা হল নরক।

অয়ন্তিকা : দারুন বলেছেন তো।

মামী : তিনি স্বর্গের বর্ণনা যা দিয়েছিলেন সেটা অনেকের ভাল লাগবেনা। বলেছিলেন, বিরাট বড় জঙ্গল কিন্তু বন-দফতরের পাহারাদারি নেই, সেটাই আদিবাসীদের জন্য স্বর্গ।

অর্ণব : এটাও কিন্তু ভাল বলেছেন। আমরা শুনেছি গ্রামবাসীদের নিয়ে বন-রক্ষা কমিটি তৈরি করার আগে সাধারণ মানুষ জঙ্গলে ঢুকলেই চুরির মামলা দেওয়া হত।

মামা : তোমাদের মামী চুপচাপ বসে আছে, ও কিন্তু এই বিষয়ে অনেক জানে। ওদের একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই অঞ্চলে বন-সংরক্ষণ আর জঙ্গল এলাকার মানুষদের নিয়ে নানা কাজ করে।

অয়ন্তিকা : হ্যাঁ, সেটা আমি জানি। মামী এই বিষয়ে খবরের কাগজে আর পত্রিকায় লিখেছে অনেকবার।

মামা : তুমি বরং ওদের বল আগে কি অবস্থা ছিল এদেশে।

অর্ণব : হ্যাঁ, হ্যাঁ – আমাদের ইতিহাসটা জানা দরকার।

মামী : ঠিক বলেছ, ইতিহাসটা সকলেরই জানা দরকার। ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার আগে এদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হত একটা সীমার মধ্যে – চাষবাস আর হস্তশিল্পের জন্য যতটা সম্পদ ব্যবহার করা হত সেটা আবার প্রকৃতি নিজেই তৈরি করে নিতে পারত।

সায়ন : বুঝেছি, যাকে বলে সাসটেনেবল বা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার।

মামী : গণ্ডগোল বাধল যখন ইংরেজরা তাদের কলকারখানার কাঁচামাল এদেশ থেকে নিতে শুরু করল। জঙ্গল কেটে সেগুন আর অন্যান্য ভাল কাঠ বিদেশে রপ্তানি করতে লাগলো। এটা উনবিংশ শতাব্দীর কথা।

সায়ন : তার মানে ব্যাপারটা আর সাসটেনেবল থাকলনা। যত গাছ কাটল তত গাছ লাগালোনা।

মামী : শুধু তাই নয়, যেসব গাছের বাজারদর কম সেগুলো কেটে দামী গাছ লাগাতে থাকল, জঙ্গলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল।

অর্ণব : তার মানে এটা অনেক কাল ধরে ঘটছে।

মামী : এদেশেও কাঠের ব্যবহার বেড়ে গেল যখন রেললাইন পাতা শুরু হল। আগে রেলের স্লিপারগুলো কাঠের হত। তা ছাড়াও টেলিগ্রাফ, টেলিফোন আর বিদ্যুতের খুঁটি - সব কাঠের।

অয়ন্তিকা : আগে এদেশে অনেক বেশী জঙ্গল ছিল – সেটা এখন বুঝতে পারছি।

মামা : ঠিক বলেছিস। পুরনো বাংলা সাহিত্য পড়ে দেখবি বারবার জঙ্গলের কথা আসছে। তখনও কিছু গাছপালা অবশিষ্ট ছিল।

মামী : কিছু লোককে গাছ কাটার ঠিকা দেওয়া হল। তারা কেউ কেউ অতি উৎসাহে দরকারের থেকে বেশী গাছ কেটে ফেলল। অতিরিক্ত কাটা গাছ বয়ে নিয়ে যেতেও খরচা আছে, তাই অনেক কাটা গাছ পড়ে থেকে পচে গেল।

অর্ণব : অরন্যের বধ্যভূমি। ভাবতেও খারাপ লাগছে।

মামী : তখন ইংরেজ শাসকদের খাজনা চাই, তাই জঙ্গল কেটে বসত করা শুরু হল। অনেক গাছপালা মুনাফা দেয়না, জঙ্গল কেটে গ্রাম বসালে সেখানকার চাষি কর দেবে সরকারকে।

মামা : সব ক্ষেত্রেই জঙ্গল কেটে বসত হলনা, কোথাও কোথাও চা বা কফির বাগান করা হল। তাতেও অনেক মুনাফা।

মামী : আর একটা কথা। এদেশে তখন বেশী কয়লাখনি ছিলনা, তাই কাঠ জ্বালিয়ে ট্রেন চালানো হত। ষ্টীম-ইঞ্জিনের আগুনে কত বনস্পতি পুড়ে গেছে তার কোন হিসেব নেই।

অয়ন্তিকা : সহদেবজেঠু বলছিলেন জঙ্গল গরীব মানুষের বন্ধু। তাকে খেতে দেয়, ঘর তৈরির সামগ্রী দেয়। নির্বিচারে জঙ্গল কেটে ফেলা মানে গরীব মানুষের কষ্ট আরও বাড়িয়ে দেওয়া। তাই না মামী?

মামী : ঠিক বলেছিস। জঙ্গল কমে যাওয়ার ফলে গ্রামের মানুষের কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। অভাবের সময় জঙ্গল থেকে খাবার পাওয়া যেত, তার অনেক কিছুই আজ অমিল। এছাড়া কিছু জায়গায় বৃষ্টি কমে গেছে, জলের অভাব দেখা দিয়েছে।

অর্ণব : চম্পাদির পাড়ায় গিয়ে খানিক বুঝতে পেরেছি সেটা।

মামী : হ্যাঁ, ওরা খুব কষ্টে আছে। কিন্তু আরও খারাপ অবস্থায় আছে যারা প্রায় পুরোপুরি জঙ্গলের ওপর নির্ভর করত বেঁচে থাকার জন্য, যারা চাষবাস আর গরু, ছাগল, মুরগি পালন করত না, সেই সব মানুষ।

অর্ণব : পুরোপুরি জঙ্গলের ওপর নির্ভর? তারা কারা?

মামী : যেমন ধরো লোধা জাতির লোকেরা। তাদের কাছে প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে ছিল জঙ্গল। যখন সেই জঙ্গল কমতে কমতে প্রায় নেই হয়ে গেল, তাদের দুর্দশার শেষ থাকল না।

সায়ন : এদেশে জঙ্গল তো একেবারে নেই হয়ে যায়নি, কিছু আছে আর আবার নতুন করে গাছ লাগান হচ্ছে।

মামী : যেটুকু জঙ্গল আছে তার মালিক কে? ইংরেজ আমলে বন-দফতর তৈরি করে সব জঙ্গলের মালিক হয়ে গেছে সরকার। সেই জঙ্গলে লোধাদের কী অধিকার আছে?

অয়ন্তিকা : ওদের জন্যে কেউ কিছু করছেনা? গভর্নমেন্টের নানারকম ব্যবস্থা আছে শুনেছি ওদের জন্যে।

মামা : আমাদের জেলাতেই বেশ কিছু লোধা পরিবারের বাস। তোর মামীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা লোধাদের জন্যে কি কাজ হচ্ছে তার খবর রাখে, সরকারকে রিপোর্ট পাঠায়।

অর্ণব : আমরা যেতে পারি লোধা গ্রামে?

মামী : তোমাদের উৎসাহ থাকলে কাল যাওয়া যেতে পারে ওখানে। আমাকে তো প্রায়ই যেতে হয়।

অয়ন্তিকা : হ্যাঁ, খুব উৎসাহ আছে। যাব আমরা।

সায়ন : হ্যাঁ, যাব।

মামা : তোমাদের লেখার বিষয় প্রাকৃতিক সম্পদ কমে গেলে বা না থাকলে মানুষের কি অবস্থা হয়, তাই তো? এই বিষয়টা লোধাদের থেকে ভাল আর কেউ জানেনা।

মামী : তাহলে কাল সকালে সবাই তৈরি হয়ে যেও। আমরা ঠিক আটটার সময় বেরিয়ে পড়ব।

পঞ্চম অংশ

(গাড়ি চলছে, ইঞ্জিন ও বাতাসের শব্দ। সকলকেই একটু উচ্চস্বরে কথা বলতে হচ্ছে)

সায়ন : আমার কিন্তু মহুলডাঙ্গায় এসে খুব ভাল লাগছে। দারুন জায়গা। আমি আবার আসব এখানে।

অর্ণব : সায়নের তো ভাল লাগবেই। আর কিছু নয়, মহুলডাঙ্গার জলের ম্যাজিক। কলকাতায় যতটা খাবার খেত এখানে তার ডবল খাচ্ছে।

অয়ন্তিকা : অর্ণব, তুই ওর পেছনে লাগছিস কেন? সায়ন ছোট ছেলে, এখন তো খাবার খাওয়ার আর লম্বা হওয়ার বয়স। খাচ্ছে খাক, তাই নিয়ে আওয়াজ দেবার কি আছে?

মামা : সায়ন তুমি যখন ইচ্ছে হয় তখন চলে আসবে, বন্ধুদের কথা শোনার দরকার নেই। তোমরা বরং লোধাদের বিষয়ে খানিকটা জেনে নাও – লেখার সময় কাজে লাগবে।

অয়ন্তিকা : হ্যাঁ মামী, আমরা ওদের সম্পর্কে কিছুই জানিনা। তুমি একটু বলো।

মামী : তাহলে একটু পুরনো কথা বলতে হয়। ভারতের কিছু জাতিকে ইংরেজ শাসকরা অপরাধ-প্রবন বলে চিহ্নিত করে। ১৮৭১ থেকে শুরু করে ১৯২৪ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতির মানুষকে একটা আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়। বলা হয় তারা স্বভাবেই অপরাধী। ফলে যে শিশু আজ জন্মাল সেও প্রশাসনের চোখে অপরাধ-প্রবন।

অর্ণব : এ আবার কীরকম উদ্ভট আইন?

মামা : শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশে।

মামী : প্রত্যেকটা জাতির মানুষকে একটা এলাকার মধ্যে থাকতে বলা হল। তার বাইরে কেউ পা রাখলে সেটাই অপরাধ গণ্য হবে। তার তল্লাশি নেওয়া যাবে আর গ্রেফতারও করা যাবে।

সায়ন : নিজের দেশে যেখানে খুশি যেতে পারবে না?

মামী : যেখানে সেখানে যাওয়া নিয়েই তো যত গণ্ডগোল। ইংরেজ শাসকদের যেমন জঙ্গল অপছন্দ ছিল, তেমন অপছন্দ ছিল জংলিপনা। মানুষ এক জায়গায় বাস করে চাষ করবে বা বাগান করবে, নতুন কলকারখানা হচ্ছে – সেখানে মজুরি করবে। তারা জঙ্গলে থাকবে কেন আর যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে কেন?

অয়ন্তিকা : তা হলে যাযাবর জাতিরা কোথায় যাবে?

মামী : সেটাই তো প্রশ্ন – যাযাবর জাতিরা কোন দোষে এমন শাস্তি পাবে বংশপরম্পরায়।

অর্ণব : ইংরেজদের এতো রাগের কারণটা কি?

মামা : ভেবে দেখলে অবশ্য একাধিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

অর্ণব : যেমন?

মামা : যেমন ধরো – যারা এতো দূর থেকে কষ্ট করে এদেশে এসেছে আমাদের সভ্য করবে বলে, তারা কি করে কিছু লোককে বনবাদাড়ে ফেলে রাখবে? সেটা কি সভ্যতা? তারপর ধরো –

এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানোও তো অসভ্যতা। তাই তাদের ধরে এক জায়গায় জমা করো আর সভ্যতা শেখাও।

মামী : তারপরে ধরো খাজনা আদায় করার ব্যাপারটা। যার চাল নেই, চুলো নেই, একটা পাকাপোক্ত ঠিকানা পর্যন্ত নেই, তার থেকে খাজনা আদায় করা সহজ নয়। এমন সব লোকদের ধরে এনে চাষআবাদ শেখাও, যাতে ভবিষ্যতে খাজনা দেবার খাতায় তাদের নাম তোলা যায়।

সায়ন : ব্যাপারটা এতদিনে পালটে গেছে নিশ্চয়। স্বাধীন দেশে এইসব কাণ্ড তো চলতে পারে না।

মামী : হ্যাঁ, আইন পালটে গেছে ১৯৪৯ সালে। স্বাধীনতার দু বছর পরেই। এখন আর ওইরকম কোন তালিকা নেই। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ পালটে গেছে কিনা সন্দেহ আছে।

অয়ন্তিকা : আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই লোধাদের কথা বলো, তারা আগে কীরকম ছিল আর এখন কেমন আছে।

মামী : সেটা দেখতেই তো যাচ্ছি। তবে তোমাদের দুয়েকটা কথা জেনে রাখা ভাল। লোধা জাতি জঙ্গলের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। জঙ্গল কমে যেতে তাদের খাবারে টান পড়ে। তারা দেখে যেখানে জঙ্গল ছিল সেখানে অন্য মানুষ চাষ করছে। গ্রামের লোকেরা বলে লোধারা কেউ কেউ সেই সব গ্রাম থেকে খাবার বা অন্য জিনিস চুরি করেছে, কেউ কেউ নাকি ডাকাতি বা অন্য গুরুতর অপরাধেও যুক্ত ছিল।

অর্ণব : অপরাধ করতেও পারে, অসম্ভব কিছু নয়। আমার খাবারের উৎস তোমরা কেড়ে নিয়েছ, আমি তোমাদের থেকে খাবার কেড়ে নেব।

মামা : বিষয়টা সহজ নয়, এবং শুধু যুক্তি দিয়ে বোঝা যাবে না। দেশের সরকার দাগা দিয়ে দিয়েছে, তুমি অপরাধী। সেই দাগ শুধু আইন করে মোছা যায়না। সময়ে সময়ে কিছু মানুষ চুরি বা অন্য অপরাধমূলক কাজ করে ধরা পড়েছে। তার প্রতিক্রিয়ায় লোধাদের গ্রাম আক্রমণ করা হয়েছে এবং লোধাদের হত্যা করা হয়েছে।

অয়ন্তিকা : কি ভয়ংকর।

মামী : অধ্যাপক ভৌমিক লোধাদের উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। ওনার একটা লেখায় পড়েছি, ১৯৬৮ সালে পাঁচজন মানুষকে হত্যা করা হয়, বারোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তার এগারো বছর পরে ১৯৭৯ সালে উনিশ জনকে হত্যা করা হয়। তারপরে আরও কিছুদিন ওই ধরণের ঘটনা চলতে থাকে।

মামা : ভেবে দেখ, ওদের জীবনে এই বিপর্যয় আসত না যদি ওদের থেকে অরন্যের অধিকার কেড়ে না নেওয়া হত। প্রাকৃতিক সম্পদের বিলুপ্তি শুধু মানুষের জীবিকা কেড়ে নেয়না, জীবনও বিপন্ন করে দেয়।

অয়ন্তিকা : মামী, এবার অন্তত বল এখন ওরা ভাল আছে।

মামী : যাচ্ছ তো নিজের চোখে দেখবে বলে। দেখে নাও তারা এখন কেমন আছে।

মামা : আমরা এসে গেছি, বাকি একটু রাস্তা পায়ে হেঁটে যাব।

মামী : এখন সবাই নিজের মত ঘুরে দেখো, গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলো। বাড়ি ফিরে আমরা আলোচনা করব কি দেখলাম, কি শিখলাম।

ষষ্ঠ অংশ

(গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ, অল্পক্ষণ পরে সেই শব্দ থেমে যায়। গাড়ির দরজা খোলা ও বন্ধ হয় অন্তত দুবার)

মামী : লোধাদের গ্রাম দেখা হল তাহলে। আমাদের বাড়ি এসে গেছে, ভেতরে চলো। তারপর তোমাদের কথা শুনবো।

(বাড়ির ভেজানো দরজা খোলা হয়, পায়ের শব্দ, বন্ধ হয় দরজা)

মামা : এবার তোমরা বল আজ সারাদিনে কি দেখলে।

অর্ণব : জঙ্গল কেটে ফেললে, জীবিকা চলে গেলে মানুষ এতো গরীব হয়ে যায়?

অয়ন্তিকা : এর পরেও মানুষ জঙ্গল কাটে, মাটিতে বিষ মেশায়, জল অপচয় করে। এদের কবে শিক্ষা হবে?

সায়ন : মহুলডাঙ্গার অবস্থা দেখে ভেবেছিলাম খুব খারাপ। আজ দেখলাম লোধারা আরও কষ্টে আছে।

মামী : তোমরা দেখনি আগে এদের অবস্থা কি ছিল, তাই খারাপ লাগছে। সত্যি কথা হল সামান্য হলেও উন্নতি হয়েছে আগের তুলনায়।

অয়ন্তিকা : কী প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে এদের জন্যে?

মামী : সারা দেশে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল কিছু মানুষের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। লোধাদের নাম সেই সূচিতে আছে। সরকার এদের জন্যে ঘর, চাষের জমি, স্কুল ইত্যাদি করে দিয়েছে।

অর্ণব : ঘর-বাড়ি আর স্কুল দেখে মনে হল খুবই দরিদ্র অবস্থা।

মামা : অন্য আর পাঁচটা গ্রামের সঙ্গে তুলনা করোনা, কারণ এদের ক্ষেত্রে শুরুটা হয়েছে অনেক দেরিতে। অবশ্য এটাও ঠিক, নানারকম কর্মসূচী থাকলেও বাস্তবে তার লাভ সকলের কাছে পৌঁছয়নি।

সায়ন : চাষের কাজে কোন উন্নতি চোখে পড়ল না। যেমন তেমন করে চাষ, জমি খালি পড়ে আছে অনেক জায়গায়। মনে হয় চাষের কাজে মন নেই এদের।

মামী : সায়ন তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ। এটা একটা বড় সমস্যা। কেউ যদি স্বেচ্ছায় জীবিকা পাল্টায় তাহলে সে নতুন জীবিকা শিখে নেয় উৎসাহ নিয়ে। কিন্তু কাউকে যদি বাধ্য করা হয় তাহলে মুশকিল।

অর্ণব : বুঝিয়ে বললেই হয় চাষের কাজে তোমাদের উন্নতি হবে।

মামা : তাই কি? ব্যাপারটা বোধহয় অত সরল নয়। কৃষকদের যখন বলা হয় তোমাদের জমি দিয়ে দাও, সেই জমিতে কারখানা হবে এবং কারখানায় কাজ করলে তোমাদের উন্নতি হবে, তারা কি খুব খুশি হয়?

অর্ণব : তা বটে, সেটা তো একটা বড় সমস্যা এদেশে।

মামা : এইবার ভাবো - কেউ তোমার প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করে দিল এবং তোমার জীবিকার উপায় চলে গেল। তখন তোমাকে বলা হল অন্য জীবিকা খুঁজে নাও। কিন্তু অন্য কোন জীবিকা তোমার পছন্দ নয়। এবার তুমি কি করবে?

অয়ন্তিকা : আমি ওইরকম অবস্থায় পড়লে ভীষণ রেগে যাব, চিৎকার করব। আর কি কি করব এখন ভেবে উঠতে পারছি না।

মামী : লোধারা একটা ছোট জনগোষ্ঠী, পশ্চিমবঙ্গে ওদের জনসংখ্যা এক লাখের কম, তাদের আমরা নিজেদের পছন্দ মত জীবিকায় থাকতে দিতে পারলাম না। তাদের কেউ বিপথগামী হয়ে গেল, কারোর মধ্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটুকুও চলে গেল।

মামা : যারা প্রকৃতির দেওয়া সম্পদ ব্যবহার করে, যেমন অরণ্যবাসী জাতিগুলো, তাদের খাবার জমিয়ে রাখার স্বভাব নেই। যখন যেমন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনভাবে জীবনধারন। অন্যদিকে কৃষকরা অনেকদিনের খাবার জমিয়ে রেখে দেয়, সেটাই তাদের স্বভাব। গোল বাধে যখন কাউকে স্বভাব পালটাতে বলা হয়।

অয়ন্তিকা : মা প্রায়ই বলে, স্বভাব যায়না ম'লে।

মামা : কেন কিছু মানুষকে স্বভাব পালটাতে বলা হচ্ছে? কারণ অন্যের লোভ মেটাতে গিয়ে তাদের জীবনধারণের সম্পদ লুঠ হয়ে গেছে। ভেবে দেখ, প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ হয়ে যাচ্ছে যতটা না প্রয়োজনে, তার থেকে বেশী লোভে। আরও মুনাফার লোভ, আরও আরামে থাকার লোভ।

অর্ণব : আজ মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ যেভাবে খরচা করছে ভবিষ্যৎ না ভেবে – এটা তো আত্মহত্যার সামিল।

মামা : এবং এটাও মনে রেখো, আত্মহত্যা মহাপাপ।

মামী : আমরা মহূলডাঙ্গায় আর লোধা গ্রামে যা দেখলাম সেটা হিমশৈলের চূড়া। সারা দেশে, সারা পৃথিবীতে দ্রুত নষ্ট হচ্ছে বনভূমি আর জলাশয়, বাতাস নোংরা হয়ে যাচ্ছে। এরপর একদিন পুরো মানবজাতিকে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী ঘোষণা করতে হবে।

মামা : মানুষ নামক এই আত্মহত্যাপ্রবণ প্রাণীটি একা মরবে না, সারা জীবজগতকে সঙ্গে নিয়ে মরতে চায় সে। স্বভাব যদি পাল্টাতেই হয়, মানুষের নিজের ভবিষ্যতকে মেরে ফেলার স্বভাবটা পাল্টানো প্রয়োজন।

****